আদিবাসী ও বনবাসীদের উৎখাত হওয়ার সেই ট্র্যাডিশন

শম্বুকের দেশ সমানে...

কুমার রাণা

২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯, ০০:০০:৩৯
শেষ আপডেট: ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯, ২৩:৩১:৩৫

তখন শৈশব। যুগপৎ সারল্য ও নিষ্ঠুরতায় উচ্ছল জীবন। কুকুরের লেজে পটকা বাঁধা, গর্ত থেকে টেনে বার করে ঢোঁড়া সাপ ধরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দূরে ছুড়ে ফেলা— ফুর্তির অভাব ছিল না। তেমনই এক দিনে, আগের রাতে দেখে আসা যাত্রাপালায় কোনও বীরপুরুষের তরবারি চালাবার অনুকরণে, দেওয়াল কাটা তরোয়ালের এক কোপে কেটেছিলাম কিশোর এক নিমগাছ। তৈরির সময় মাটির দেওয়াল সমান করার জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রটিতে অস্ত্রের ধার থাকত না ঠিকই, কিন্তু শিশু নিমগাছ কাটার জন্য আয়ুধের ধার নয়, ভারই যথেষ্ট। উত্তেজনায় অসতর্ক, জানতে পারিনি অদূরে ভগানকাকা দাঁড়িয়ে। ভগান মুর্মু, আমাদের বাড়ির বছর-চুক্তি মজুর, কিন্তু এই শৈশবে পিতৃহীনের অভিভাভবক। প্রায় দৌড়ে এসে ভগানকাকা লাগিয়েছিলেন কষিয়ে এক চড়— একটা গাছ কেটে ফেললি? জানিস না কাঁচা গাছ কাটতে নেই? আমাদের আদিবাসীপ্রধান এলাকায়, নিতান্ত প্রয়োজন না হলে, বিশেষত অপরিণত গাছ কাটা ছিল নিষিদ্ধ। বসত গড়তে বন তো কাটতেই হয়, আবার বসত ঠিক রাখার জন্যই বনকে সুস্থ রাখতে হয়, এই ছিল স্বাভাবিক নীতি।

হাজার হাজার বছর ধরে চলে আসা এই নিয়মে আদিবাসী মানুষ নিজের মতো করে কী ভাবে বনকে বাঁচিয়ে রাখেন তার আর এক নিদর্শন দেখেছিলাম দুমকা জেলায়। সহকর্মী ও বন্ধু নিত্যা রাওয়ের সঙ্গে গিয়েছিলাম মহুলো গ্রামে। চারিদিকে ঘন অরণ্য। তার মধ্যে গোটা পঞ্চাশ সাঁওতাল পরিবারের বাস। বেলা আটটা হবে। দুই স্ত্রী-পুরুষ বেরোচ্ছেন জঙ্গলে কাঠ আনতে। তন্নিষ্ঠ গবেষিকা নিত্যার প্রশ্ন, জঙ্গল কত দূর? সাঁওতালের জন্মজাত রঙ্গপ্রিয়তায় স্ত্রীলোকটির প্রতিপ্রশ্ন, যাবে? চলো না দেখে আসবে কত দূর?

হাঁটতে হাঁটতে জঙ্গল পেরিয়ে, কেটে নেওয়া ধানজমি পেরিয়ে, পাহাড়— হাঁটা আর শেষ হয় না। পাহাড়ের পাকদণ্ডী ধরে উঠছি তো উঠছি, বদলে যাচ্ছে গাছপালার প্রজাতি। সেই পাহাড়ের একেবারে ছাদে, একটুখানি সমতল জায়গায় দেখা গেল প্রচুর শুকনো ডালপালা। জানা গেল, মাল পাহাড়িয়া জনজাতির লোকেরা, যাঁরা সাঁওতালদের মতো স্থায়ী কৃষিতে দক্ষ হয়ে ওঠেননি, তাঁরা পাহাড়ে পাহাড়ে কুরাম চাষ করেন। কতকটা জায়গায় গাছগুলোকে দেড়-দু'মানুষ উপর থেকে কেটে ফেলে তার নীচে খন্তা বা শাবল দিয়ে গর্ত করে তাঁরা পুঁতেন বরবটি, ভুট্টা, শিম। ফসল কেটে নিয়ে যাওয়ার পর অন্তত তিন বছর তাঁদের সেই জঙ্গলে ঢোকা নিষেধ। এই অবসরে জঙ্গল নিজের মতো জীবন ফিরে পায়। ফসল তোলার পর গাছের কাটা,

শুকনো ডালপালাগুলো কুড়িয়ে নিয়ে যান আশেপাশের গ্রামের মানুষ, দু'তিন ঘণ্টার হাঁটা পথ এঁদের কাছে আশপাশ।

নিত্যা অবাক— নিজের গ্রাম জঙ্গলের মাঝখানে হওয়া সত্ত্বেও, লোকেরা এত দূর কেন আসেন কাঠ নিতে? ওকে শৈশবে ভগানকাকার কাছে খাওয়া থাপ্পড়ের সঙ্গে অর্জিত জ্ঞান বিতরণ করা গেল। আদিবাসী জীবনে কাঁচা কাঠ কাটার ওপর শর্তাধীন নিষেধাজ্ঞার কাহিনি নিত্যার নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ওপর কিছু প্রভাবও ফেলল। আমরা জেনেছিলাম, আজ যে স্ত্রীর সঙ্গে পুরুষ এসেছেন, এমনটা রোজ রোজ হয় না, সাধারণত মহিলারা দল বেঁধে আসেন, আজ কোনও কারণে দল হয়নি, তাই পুরুষটি কেবল সঙ্গ দিতে এসেছেন। নিত্যার প্রথমে মনে হয়েছিল, এটা মেয়েদের ওপর কাজের বোঝা চাপানোর পুরুষতান্ত্রিক ঐতিহ্যের আর এক নমুনা। কিন্তু বন সংরক্ষণের সামাজিক বিধিবদ্ধতার তথ্যটা এখানে কিছুটা জটিলতা এনে দিল। সেই পাহাড়ের চূড়ায় প্রায় ঘণ্টা তিনেক সময়, যত ক্ষণ সেই স্ত্রী-পুরুষ ডালপালা পরিষ্কার করে কাঠের বোঝা বাঁধলেন— স্ত্রীর বোঝাটি বৃহৎ, পুরুষেরটির তুলনায় প্রায় তিনগুণ— তত ক্ষণ আমাদের সময় কাটল তত্ত্ব আলোচনায়। আমরা আর কী-ই বা করতে পারি! ক্ষুধা বেড়ে চলছিল, আমরা চাইছিলাম মানুষ দু'টি তাড়াতাড়ি

কাজ সারুন, যাতে গ্রামে ফিরে পেটে কিছু দেওয়া যায়। আমাদের মনে মনে করা প্রার্থনা তাঁদের কানে যায়নি। অতএব গ্রামে ফিরতে ফিরতে সূর্য পশ্চিম পাটে।

ফিরতে ফিরতে সেই নারীকে দেখছিলাম আর আশ্চর্য হচ্ছিলাম তাঁর শ্রমাভ্যাসে। বিরাট বোঝার ভারের সঙ্গে পায়ের ভারসাম্য বজায় রেখে পাহাড় থেকে নামার এই কুশলতা সে দিন যতখানি বিস্মিত করেছিল, আজ কুড়ি বছর পর তা তারও চেয়ে বেশি লজ্জিত করছে। এত শ্রমে যাঁরা হাজার হাজার বছর ধরে বনকে রক্ষা করার বিদ্যা শিখে এসেছেন, বনকে রক্ষা করে এসেছেন, আজ সেই বনে তাঁদেরই বসবাসের অধিকার নেই, তাঁদেরই বলা হচ্ছে অরণ্য ধ্বংসকারী! ব্রিটিশ অধিকারের পর থেকে এই মানুষদের ক্রমাগত তাঁদের স্বভূমি থেকে উৎখাত করে চলা হচ্ছে। যা ছিল তাঁদের নিজস্ব অর্জন, সেই প্রকৃতির সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ককে বিনষ্ট করা হয়েছে, তাঁদের ঘর-বাড়ি, তাঁদের মাটি, তাঁদের অরণ্য কেড়ে নিয়ে খনি হয়েছে, বাঁধ হয়েছে, কারখানা হয়েছে। বিনিময়ে তাঁরা পেয়েছেন তাঁদের কাছে এ যাবৎ অজানিত শঠতা, বঞ্চনা। সেই অপরাধের নামমাত্র প্রতিকারটুকুও রাষ্ট্র আজ ফেরত নিয়ে নিচ্ছে। দীর্ঘ দিন ধরে অরণ্যবাসী মানুষ যে অন্যায্যতা ও অত্যাচার সয়ে এসেছেন, তার যৎসামান্য সংশোধন করার পদক্ষেপ বন-অধিকার আইন ২০০৬। কিন্তু আমাদের মতো সভ্য-সমাজে আইন তৈরি হয় লঙ্ঘিত হওয়ার জন্যই। আইন বলেছিল, আদিবাসী ও অন্যান্য বনবাসী মানুষের জন্য বনভূমিতে বসবাস, কৃষি ও বনজ সম্পদের ওপর স্বত্বের মধ্য দিয়ে জীবিকা অর্জন সুনিশ্চিত করতে। মানা হয়নি। আইন তৈরি হওয়ার এক দশক পরেও দেখা গিয়েছে, যত মানুষ তাঁদের হকের জন্য দরখাস্ত করেছেন তার মাত্র ক্ষুদ্র এক ভগ্নাংশকেই কাগজে কলমে সেই হক দেওয়া হয়েছে। কেন দেওয়া হল না? কারণ, তাঁরা তাঁদের অধিকার সংক্রান্ত যথেষ্ট প্রমাণ দেখাতে পারেননি। যাঁরা নিজেরা দরখাস্তটুকুও লিখতে পারেন না— সেই সামর্থ্য অর্জনের সুযোগই যাঁরা পাননি— তাঁদের হয়ে দরখাস্ত লিখে দিতে হয় অন্যদের, তাঁরা জোগাড় করবেন প্রমাণ? প্রমাণ জোগাড় করার মালিক তো সরকার, তথাকথিত সভ্যসমাজের প্রতিনিধি।

যখন ছত্তীসগঢ়ের দান্তেওয়াড়ার কোনও গ্রামে, যেমন আনারুলাতে, খনির জন্য আদিবাসীদের জমি দখল করতে হয়, তখন প্রমাণ জোগাড় করে সরকার। যে হেতু আদালতেরই রায় আছে আদিবাসী এলাকাতে গ্রামসভার অনুমতি ছাড়া খনি বা ওই জাতীয় বাণিজ্য-ব্যাপার করা যাবে না, এবং ওড়িশার নিয়মগিরি পাহাড়ে বেদান্ত নামক কোম্পানিকে পিছু হটতে হয়েছিল, সরকার ও পুঁজিপতিরা নিজেদের একটু অন্য ভাবে শিক্ষিত করে তুলল— আনারুলাতে এমন ৯১ জন

লোককে নিয়ে গ্রামসভা করে ফেলা গেল, যাঁদের এক জনও সেখানকার বাসিন্দা নন। ঝাড়খণ্ডের গোড্ডা জেলায় কয়েক হাজার একর জমি দখল নিয়ে নিল আদানির কোম্পানি। তাদের হয়ে প্রমাণ ও পুলিশ দুইই জোগাল সরকার।

রাজ্যে রাজ্যে এমনই সব সরকার ক্ষমতায় আসীন যারা তাবৎ প্রাকৃতিক সম্পদ— বন-নদী-খনিজ— যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তথাকথিত শিল্পোদ্যোগীদের হাতে তুলে দিয়ে কৃতার্থ হয়। এ বার তাদেরই হাতে যখন পড়ে আইন রূপায়ণের ভার তখন যা হওয়ার তা-ই হয়, দোষ চাপে বনবাসীদের ওপর— ওরা নিজেদের হকের প্রমাণ দেখাতে পারেনি, অতএব উৎখাত করো। আদিবাসী ও অন্য বনবাসীদের হয়ে আদালতে লড়ার কেউ নেই। লড়বার কথা ছিল সরকারের, তার দায় নেই। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলো যে বন আইন রূপায়ণে ব্যর্থ হয়েছে তাদের কী শাস্তি হবে, এ প্রশ্ন কেউ করেনি। এ প্রশ্নটাও ওঠেনি যে উন্নয়ন প্রকল্পের নাম করে যে লক্ষ লক্ষ বনবাসীকে ঘরছাড়া করা হয়েছে, তাঁদের জীবন-জীবিকার ওপর আক্রমণ নামিয়ে

আনা হয়েছে, সেই অবিচারের প্রতিকারে কী ব্যবস্থা করা হল।

জতুগৃহের দহন থেকে বাঁচবার জন্য পঞ্চপাণ্ডব ও তাঁদের ন্যায়শীলা মাতা আদিবাসী রমণী ও তাঁর পঞ্চপুত্রকে অগ্নিদগ্ধ করতে দ্বিধা করেননি। বেদাভ্যাসের অপরাধে শম্বুককে হত্যা করতে মর্যাদা পুরুষোত্তমের হাত কাঁপেনি। ন্যায্যত অপ্রাপ্য গুরুদক্ষিণা হিসেবে একলব্যের আঙুল কেটে নিতে বিবেক কুণ্ঠিত হয়নি গুরু দ্রোণাচার্যের। আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ বিবেকে বিশ্বাসী। বেহক হওয়া আদিবাসী-বনবাসী পরিবারগুলোর সংখ্যা দশ লক্ষাধিক বই তো নয়, ভারতের মোট পরিবারের সংখ্যা সিকি কোটিরও বেশি। অতএব আমরা পশুর অধিকারে যুদ্ধে যাব। রাষ্ট্রীয় ন্যায়ের সুদর্শনা দেবীর কাছে, মানুষ— কিছু মানুষ— এবং পশুর মধ্যে পার্থক্যই বা কতটুকু! তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধজয় তো অতীব সহজ!